সংবাদ

সোহরাব হাসান

উচ্চশিক্ষার নিম্নযাত্রা

মানব ইতিহাসে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় জাতির সম্পদ তথা দাবিদার উচ্চশিক্ষার গুণগত মানের ওপর আজ বেশি নির্ভরশীল— মালকম গ্রিলিস

আমাদের যা কিছু দুর্গতি, যা কিছু অসঙ্গতি ও দুর্বলতা তার মূলে রয়েছে অশিক্ষা। আমরা নিজেরা যেমন শিক্ষা নিয়ে উন্নত জাতি গঠনে ব্রতী হতে পারিনি, তেমনি অন্যান্য জাতির উন্নতি-অগ্রগতি থেকেও শিক্ষা নেইনি। শিক্ষার মূল কথা হল, যুক্তি, অধ্যবসায়, সাধনা, নিবিড় অনুশীলন, পাঠদান ও পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়া। আমাদের জাতীয় মানস ও চরিত্র এর বিপরীত দিকে চলতে সচেষ্ট। আমরা শিক্ষাকে মনে করি সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় বিষয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরিণত করেছি মাস্তানদের আখড়ায়। এখানে জ্ঞানের অনুশীলন হয় না, অস্ত্রের মহড়া হয়। অধিত বিদ্যাকে কি করে তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো যায় সে নিয়ে আমরা ভাবি না, প্রাতিষ্ঠানিক পদ-পদবি নিয়ে লড়াই করি। রাজনীতির মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এখন মেধাবীদের বাদ দিয়ে দলীয় ক্যাডারদের কদর বেড়েছে। পূর্ববর্তী সরকার একজন দলীয় ক্যাডার নিলে পরবর্তী সরকার দশজন ক্যাডার নিয়ে তার মোক্ষম জবাব দেয়। অতীতের ভুল থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। সেমিনারে-সিম্পোজিয়ামে পরস্পরকে দায়ী করে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। কিন্তু নিজে সংশোধন হতে চাই না।

শিক্ষাঙ্গনে দলীয়করণ ও রাজনীতিকরণের মহড়া যে নব্বই দশকের শুরুতে কথিত গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে সর্বনাশা রূপ নেয়— তাতে সন্দেহ নেই। তার আগে সামরিক শাসকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিজস্ব সমর্থক বাহিনী গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেও পুরোপুরি সফল হননি। হিজবুল বাহারে সফর ও মজিদ কমিশন গঠনের মধ্যে তাদের তৎপরতা অনেকখানি সীমাবদ্ধ ছিল। তারও আগে স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকার শিক্ষাঙ্গনকে দলীয়করণে সফল না উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। এখনও পর্যন্ত মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বই বাংলায় করা সম্ভব হয়নি। সম্ভব হয়নি বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ের অনেক বইও। অথচ শিক্ষার্থীদের বলা হল, তারা বাংলা ও ইংরেজি যে কোন মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে পারবে। বাংলা ভাষায় বই প্রণয়ন না করে বাংলা মাধ্যম চালুর অর্থ হল শিক্ষার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে না পড়তে উৎসাহিত করা। ফলে তারা নীলক্ষেতের দোকান থেকে ফটোকপি করে পরীক্ষার বৈতরণী পার হয়।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি নিয়ে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে তা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অব্যবস্থা, অসঙ্গতি ও নৈরাজ্যেরই বহিঃপ্রকাশ। একটি দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির চাবিকাঠি হল শিক্ষা। যে জাতি শিক্ষায় উন্নতি করেছে সে জাতি ততো উন্নত হয়েছে। অথচ স্বাধীনতার পর এই খাতটিকে পূর্বাপর সরকারগুলো অবহেলা ও অগ্রাহ্য করে গেছে। যারা জনগণের ভোটে ক্ষমতায় এসেছেন তারা কমিটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আটটি বিভাগ যথাক্রমে বাংলা, ইংরেজি, ভাষাতত্ত্ব, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এসব বিভাগে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের এইচএসসিতে বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের পাঠ্যক্রম থাকতে হবে। এখানে কোথাও বলা নেই মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের এসব বিভাগে ভর্তি করা যাবে না। তারপরও দেখা গেল একটি মৌলবাদী ছাত্রসংগঠনের প্ররোচনায় একদল মাদ্রাসাছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেছে, উপাচার্যের কক্ষে হামলা চালিয়েছে। তাদের আবদার হল, বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের এ সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। আলিম পরীক্ষায় যারা ১০০ নম্বরে বাংলা ও ইংরেজিতে পরীক্ষা দিয়েছে তাদেরও ভর্তি করতে হবে। আলিম পরীক্ষায় বাংলা ও ইংরেজিতে ১০০'র বেশি নম্বর নেয়া যাবে না তা বলা হয়নি। যারা ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়বে তারা ন্যূনতম ২০০ নম্বর নিয়েই

দলের শিক্ষকরা যে সমস্যাটি বোঝেন না তা নয়। তারা একাডেমিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান চাইছেন। অর্থাৎ রাজনীতিকে জয়ী করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষায় যারা সমতা আনার কথা বলছেন, তারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার নৈরাজ্য সম্পর্কে একেবারে নীরব। বর্তমানে দেশে বিচিত্র ও বিপরীতমুখী শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। মোটা দাগে আমরা একে তিনভাগে ভাগ করতে পারি : সাধারণ, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা শিক্ষা। এর প্রতিটিতে রয়েছে উপভাগ। যেমন সাধারণ শিক্ষার মধ্যে একাংশ সরকারি অবেক অংশ বেসরকারি। মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে একাংশ আলিয়া অপরাংশ কওমি। ইংরেজি মাধ্যমেও রয়েছে দুই ভাগ। একভাগ চলছে বিদেশী কারিকুলাম— ও লেভেল-এ লেভেল পদ্ধতিতে। আরেকভাগ দেশীয় কারিকুলামে। এর একটির সঙ্গে আরেকটির রয়েছে পর্বত প্রমাণ অমিল। এই বিচিত্র শিক্ষা পদ্ধতিকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এক পঙ্‌ক্তিতে

অন্যদিকে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা পদ্ধতিকেও সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বা তদারকিতে এনে সেখানেও শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে ও সমান গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় ভাষা শিক্ষা এবং জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটাতে হবে। পাশাপাশি দেশের সাধারণ শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং এই ধারায় পড়ালেখা করেও যাতে একজন শিক্ষার্থী যথেষ্ট ভালোভাবে ইংরেজি শিখতে পারে সেভাবে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

সাধারণ শিক্ষা মাধ্যমে পাঠ্যক্রম বা কারিকুলামে ইংরেজি শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে তা বলা যাবে না। বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সব শিক্ষার্থী বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি-বাংলা বিষয়ে পাঠ নিয়ে থাকে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও ২০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। তা সত্ত্বেও কেন অধিকাংশ শিক্ষার্থী এইচএসসি এমনকি স্নাতক পাস করেও শুদ্ধ করে একটি ইংরেজি বাক্য লিখতে পারে না। এর জন্য পাঠ্যক্রমের চেয়ে পাঠদান পদ্ধতিই অধিক দায়ী। ১০-১২ বছর ইংরেজি ভাষা পাঠ করেও শিক্ষার্থীরা সে ভাষায় ন্যূনতম জ্ঞান আহরণ করতে না পারলে বুঝতে হবে এর মধ্যে মস্তবড় ফাঁকি আছে। ইংরেজ আমলে অভিযোগ করা হতো তারা মাছিমারা কেরানি বা মুখস্থবিদ্যাশিক্ষা দেয়ার জন্যই পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করেছে। শিক্ষকরা ক্লাসে নোট করে দিতেন, ছাত্ররা সেই নোট মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় উগড়ে দিত। সেখানেও হয়তো শিক্ষার্থীরা কিছু শিখতে পারত। কিন্তু এখন অবজেকটিভ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হওয়ায় শিক্ষার্থীদের আর কষ্ট করে বই পড়তে হয় না। নীলক্ষেত বাজার থেকে নটবই বা গাইড কিনে প্রশ্নগুলোর সামনে টিকচিহ্ন রপ্ত করলেই পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া যায়। আর আমাদের পণ্ডিতব্যক্তিরা একেই বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা পদ্ধতি বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। ইংরেজি বিদেশী

11 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...